Rethinking Political Economy and Development

শীর্ষক সেমিনার

রবীন্দ্রনাথের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা ও কার্যক্রম

মেহেরুননেছা
রিসার্চ ফেলো
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ডিসেম্বর, ২০১৪

রবীন্দ্রনাথের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা ও কার্যক্রম

– মেহেরুননেছা

সারসংক্ষেপ:

সাহিত্যে নোবেলপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে পরিচিতি লাভ করেন কিন্তু অর্থনীতিবিদ-সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি কতটা স্বীকৃত ও সফল সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। পল্লী সমাজের গণমানুষের জীবনধারার মান উন্নয়নে কৃষি ও সামগ্রীক সামাজিক অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং কিভাবে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে হবে সে সম্পর্কে তাঁর ভাবনার বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী দিকনির্দেশনামূলক তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষক ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, সকলের জন্য শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তিনি যে কৌশল অবলম্বনের কথা বলেছেন,সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কৃষিঋণের প্রবর্তন, প্রয়োগ ও সুফল সম্পর্কে তাঁর নীতিনির্ধারণী তত্ত্ব আজকের প্রেক্ষাপটে প্রায়োগিক বিশ্লেষণ অতিশয় গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থনীতিবিদ না হয়েও পল্লী উন্নয়ন, সামাজিক বনায়ন, কৃষিঋণদানে কৃষি তথা গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে এবং তিনি কোন্ মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেছেন সে বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আবক্ষমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে স্থান পেয়েছে । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পল্লীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ব্যতীত কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন যে সম্ভব নয়, তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রায়োগিক কৌশলগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এই প্রবন্ধে ।আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিনি একটি সফল সমাজ-কাঠামো গড়ায় যা কিছু প্রয়োজন তার সকল শাখায় আলোকপাত করেছেন ।কৃষি ভাবনা, সমবায় ভাবনা, গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, মানবিক উন্নয়ন ভাবনা, সাম্যবাদী সমাজভাবনা, শিক্ষাভাবনা, পরিবেশভাবনা ইত্যাদি। একটি সমাজের উন্নয়নে এসব ভাবনাগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

ভুমিকা:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যিনি নিরেট একজন কবি এবং মানবিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর ভাবনাগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। প্রচণ্ড দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বৃত্ত মহাজন কর্তৃক কৃষক শোষণের মতো নৈমিত্তিক সমস্যাগুলি পল্লীর একটি শ্রেণিকে বৈষম্যের বেড়াজালে আকীর্ণ করে। জমিদারির দায়িত্বপ্রাপ্তির পর পল্লীর এই শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা গভীরভাবে অবলোকন করার প্রয়াস পান এবং তাঁর কবিমন বেদনায় সিক্ত হয় তাদের মানবেতর জীবনযাপন পর্যবেক্ষণ করে।

কবি হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি বিশ্বময়। গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়। পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেছিলেন-"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি পশ্চিমা দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি শেক্সপিয়ার কিংবা গ্যেটের মতোই শ্রদ্ধাশীল হতেন।" বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা বাংলা ভাষাভাষি কোটি কোটি মানুষের কাছে কতটা গ্রহণীয় ও বিস্তৃত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বিশ্বপরিমণ্ডলে বিশেষত পশ্চিমা দেশে ততটা সাড়া জাগাতে না পারলেও ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁর সৃস্টির জন্য আলোচিত হচ্ছেন। নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে চেনা ও জানার জন্য উচ্চতর গবেষণা হচ্ছে। সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একদিক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনার প্রবক্তা ও উদ্যেগ গ্রহণের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক পরিবর্তনের নতুন ধারণার প্রবর্তক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুধা চিন্তিত আধুনিক মতবাদ ও ব্যবহারিক কৌশল আলোচনা ও বিশ্লেষণ গুরুত্বের দাবিদার।

উদ্দেশ্য:

তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষকের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন এবং এ যাবৎকাল পর্যন্ত তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি ।রবীন্দ্রনাথ এসব হতভাগ্য কৃষকের আর্থ-সামাাজিক উন্নয়নে যে সকল ভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা বিধৃত ও বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রামীণ সমাজের মানুষের চির দারিদ্র্য ঘোচানো, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করা, সামন্তবাদী মহাজনের ঋণের চাকায় পিষ্ট

কৃষককুলকে দায়মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন, সমবায় আন্দোলন ও এসব ভাবনাগুলোর বাস্তবায়ন সার্বিকভাবে তৎকালীন প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে সেদিকটি আলোকপাত করা ।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের এসব ভাবনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ ও তা নিরূপণের প্রয়াসও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

কৃষি ভাবনাঃ

পল্লীপ্রধান এদেশের উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন গ্রামগুলোকে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করত । পল্লীর প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বটে কিন্তু শহর ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার বৈষম্য তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি । তাই তিনি সর্বপ্রথম পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীমঙ্গলের কথা ভেবেছেন । পল্লীর অধিকাংশ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবী সেহেতু কৃষির উন্নয়ন ভাবনা ছিল অনিবার্য । তিনি কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন ও পুনর্গঠনের কথা ভাবেন যা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এক যুগান্তকারী কৃষি উন্নয়ন ভাবনা । গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি খুব নিকট থেকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছিলেন পতিসরে জমিদারি দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর যা কবি-হৃদয়কে বিষন্ন করে তোলে । তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন ও আয় বাড়ানো সম্ভব । বর্তমান অর্থনীতিবিদরা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যে কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ সে ভাবনায় ছিলেন অগ্রণী । তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষ এবং এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির প্রবর্তক । তাঁর এই পদ্ধতি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল কিন্তু জমি খণ্ডীকরণের ফলে এই পদ্ধতি কিছুটা বিঘ্নিত হলেও কৃষকরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যাবহারের ফলে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন ও আয় সম্ভব । খণ্ডিত জমি একত্রে চাষাবাদের জন্য তিনি সমবায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন । কৃষিক্ষেত্রে এসব সমস্যা সমাধানকল্পে এবং কৃষকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিজ পুত্র রথীনদ্রনাথকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান পড়ার জন্য । পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ সালে ও জামাই নগেন গাঙ্গুলীকে ১৯০৭ সালে কৃষিবিষয়ক প্রযুক্তিগত শিক্ষাগ্রহণ এবং পশুপালনের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে আনেন । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষিশিক্ষার জন্য আমেরিকা যাত্রার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন-

> "বাবা জানতে পেলেন যে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাঙালি ছাত্র পাঠাবার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি শিক্ষার্থীর দল কিছুদিনের মধ্যে জাপান ও আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে । সন্তোষ ও আমাকে বলে দিলেন এই দলের সঙ্গে যোগ দিতে । আমাদের গন্তব্য হবে আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কৃষি ও পশুপালন বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে । ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ষোলটি প্রাণী জাপানগামী একটি মালবাহী জাহাজে চড়ে কলকাতা থেকে পাড়ি দিলাম । উচ্চশিক্ষার জন্য সুদূর বিদেশ যাচ্ছি, সম্বলের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দেওয়া জাপানী মালবাহী জাহাজের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের একখানা টিকিট এবং একগুচ্ছ পরিচয়পত্র ।"[১]

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি কৃষির বহুমুখীকরণের জন্য নানাবিধ অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদনে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহন করেন যেমন তাঁতশিল্প, বয়নশিল্প, রেশমশিল্প ইত্যাদি । উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি ।এ উদ্দেশ্যে তিনি পল্লী পুনর্গঠণের কাজ শুরু করেন শ্রনিকেতনে এবং কৃষিউন্নয়ন ও

কৃষককে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করেন । প্রতিবছর বন্যা ও ক্ষরার কবলে পড়ে কৃষকের জমি ক্রমাগত অনুর্বর হয়ে ফসলহানি ঘটায় । উপরন্তু তাদের কৃষিজমি বেহাত হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্বেও ঋণ পরিশোধ ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাজনের দারস্থ হয় । অপরদিকে মাথার ওপর থাকে খাজনার বোঝা । এই ত্রিমুখী দুষ্টচক্রের চাকায় কৃষকের জীবন পিষ্ট হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ব্যাংক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে কৃষককে মহাজনদের নিষ্ঠুরতার জাল থেকে কৃষককে রক্ষা করা ।এবং ব্যয়সাপেক্ষ উন্নত ও যান্ত্রিক চাষপদ্ধতি কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা । এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> "এদিকে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালের শেষের দিকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে কৃষিস্নাতক (BSc. Ag) হয়ে ভারতে এসে পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য পূর্ববঙ্গে নিজেদের জমিদারির আওতাভুক্ত গ্রামগুলিতে উন্নত প্রথায় কৃষিকার্য শুরু করেন । রথীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে সম্ভবত তখন প্রথম কৃষিস্নাতক । তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের জন্য শিলাইদহ ও পতিসরে এদেশের উপযোগী নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি, উন্নত প্রজাতির শষ্যবীজ, কেমিক্যাল সার ইত্যাদি ব্যবহার করে চাষবাস শুরু করলেন । চাষীদের ডেকে তা দেখানো হলো যাতে তারা নিজেদের জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করে অধিক উৎপাদন করে নিজেদের দরিদ্রদশা ঘুচানোর পথে এগুতে

পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষবাস করতে হলে বেশি মূলধন দরকার এই চাষে যথাযথ উপকরণ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু দরিদ্র চাষীদের কাছে অর্থ তো দূরের কথা, তারা সুদখোর মহাজনদের কবলে পড়ে ঋণগ্রস্ত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃষিবিজ্ঞানী পুত্রের প্রচেষ্টার কাছে এরকম ভীষণ অন্তরায় দেখে ১৯১৩ সালে তিনি যে নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ আট হাজার টাকা পেয়েছিলেন পতিসরে গ্রামীন ব্যাংক খুলে সেখানে সম্পূর্ণ টাকা রেখে চাষীদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস জন্য যোগানের ব্যবস্থা করেন। (শুধুমাত্র সুদের টাকা শান্তিনিকেতনের স্কুলের জন্য নিধারিত করা হল।) বর্তমানে স্বাধীন ভারতে সর্বত্র গ্রামীণ ব্যাংক দেখা যায়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত পতিসর গ্রামীণ ব্যাংক ঘটনাক্রমে ১৯১৫ সালের মতো সময়ে ভারতবর্ষের প্রথম গ্রামীণ ব্যাংক।"[২]

পল্লীর হতভাগ্য কৃষকের জীবনযাপন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য তিনি গভীর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এসব কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং তার প্রয়োগ ও প্রসার দেখতে চেয়েছিলেন ।

সমবায় ভাবনাঃ

সাধারণ অর্থে সমবায় বলতে বুঝায় একটি সমাজের কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা ব্যাপক ও বিশেষ কিছু ধারণা বহন করে। সুতরাং একারণে তাঁর সমবায় ভাবনা অন্যান্য ভাবনার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশষজ্ঞের ধারণামতে, তাঁর সমবায় ভাবনাটি মূলত আয়ারল্যাণ্ড ও রুশ সমাজ কাঠামোর উন্নয়ন ভাবনা থেকে এসেছে । তিনি সমবায় ভাবনাটির এমন কিছু সুনির্দিষ্ট তত্ত্বগত দিকে আলোকপাত করেছেন যা প্রচলিত ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্ন।বাহ্যিক কিছু অর্থনৈতিক বা সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কিছু সংঘববদ্ধ মানুষের সমন্বিত রূপ হলো সমবায় । কিন্তু তিনি সংঘবদ্ধতার তুলনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন পারস্পারিক মানসিক একাত্মতার ওপর অর্থাৎ আদর্শগত ঐক্যবদ্ধতা। কেবলমাত্র শ্রম এবং অর্থ বিনিয়োগ করে নয় বরং কাউকে না ঠকিয়ে মানসিক ঐক্যবদ্ধতার সমন্বিত রূপের ভেতর নিহিত রয়েছে একটি আদর্শ সমবায় কাঠামো। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

"কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করবার জন্য তিনি সমবায়নীতির পথ তার কর্মের পথ হিসেবে গ্রহণ করেন। একতার বদলে ঐক্যের ও সংঘবদ্ধ শক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে চাইলেন সমবায়ের মাধ্যমে সে শক্তি অর্জন দুর্বলের পক্ষে সম্ভব। তার ভাষায়–'অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন'। এভাবে তার সমবায় ভাবনা কর্মের পথ ধরতে চেয়েছে।"[৩]

কোনো ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা চলতে গেলে তখনই সে একটি টুকরো মানুষ এবং সে হয়ে পড়ে একটি অপূর্ণাঙ্গ মানুষ। একটি অসম্পূর্ণ মানুষ একা কোনোকিছু করতে পারে না, দশজনে মিলে যা করতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সমবায় খামার গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমবায়ের মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। তাঁর মতে মানুষ যখন একত্রিত হতে পারে না তখনই তার দীনতা প্রকাশ পায়। মানুষের এই ক্ষুদ্রতাকে তিনি অনুর্বর বালু মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বালু মাটি একত্রে দানা বাঁধতে পারে না বলে সে মাটিতে ফসল হয় না। কর্মশ্রমকে একত্রিত করে জনসাধারণের জন্য অর্থশক্তি অর্জনে সমবায়নীতির পথকে তিনি সঠিক পথ হিসেবে মনে করতেন। সমবায়ের মাধ্যমে দুর্বলের পক্ষেও সেই শক্তি অর্জন সম্ভব যে শক্তি ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর মতে, অসংখ্য দরিদ্র মানুষ যখন নিজস্ব সামর্থ্য একত্রিত করতে পারবে সেই মিলনই মূলধন। তাঁর সমবায় ভাবনায় তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, তিনি চেয়েছিলেন সমবায় ব্যবস্থায় কোনো আমলাতান্ত্রিকতার উপস্থিতি থাকবে না, সমবায়নীতির মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাতে জনগনের পুরোপুরি স্বায়ত্ত্বশাসন বহাল থাকবে এবং তদসঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগ ঘটাতে হবে। পারস্পারিক ঐক্যবদ্ধতা ও সংঘবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগের সঙ্গে সমবায় ব্যবস্থায় জনগনের সার্বভৌমত্বের সমন্বয়–রবীন্দ্রনাথের সমবায় ব্যবস্থার এ ধারণা নি:সন্দেহে গতানুগতিক সমবায় ধারণা থেকে ভিন্ন মাত্রার সংযোজন বলা যায়। সমবায়কে তিনি এভাবে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করতেন ধন–সম্পদ কোনো একক ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের হাতে গচ্ছিত থাকবে না , সর্বসাধারণের শক্তি সম্মিলিত হয়ে সে ধন হবে সমবায়ের মাধ্যমে জনগনের সম্পদ। পল্লীকে আধুকায়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য তিনি কেন্দ্রিয় সমবায় ব্যাংক, সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়, সেচ

সমবায়, মৎস্য চাষ সমবায়, তন্তুবায় সমবায়, সমবায় ভাণ্ডার, ধর্মগোলা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন । তাঁর সমবায় ভাবনাটি অর্থনীতিতে Cooperative societyকেই বুঝায় না, ভাবনাটির দ্বারা Economic of large scale production conceptকেও নির্দেশ করে । এক কথায়, কেবল ঐক্যবদ্ধতা দিয়ে নয় একটি আদর্শ সমবায় গড়ে তুলতে হলে সততা এবং মানসিক সংঘবদ্ধতা থাকতে হবে । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

"বালি জমিতে ফসল হয় না, কেননা তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায় । তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি , পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয় । মানুষেরও ঠিক তাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয় ।"[৪]

তাঁর যৌথ খামার ধারণাটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাঁর সমবায় ভাবনাটি । তিনি মনে করতেন আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির প্রধান বাধা হচ্ছে খণ্ড খণ্ড জমি । সমবায়নীতির মাধ্যমে খণ্ড–বিখণ্ড জমিগুলোকে যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব । সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য ঘোচাতে হলে সর্বপ্রথম তিনি কৃষককে আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তাঁর মতে আত্মশক্তির জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো আত্মবিশ্বাস । তিনি সবসময় মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষ এক অফুরন্ত শক্তির আধার । মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি বিরাজমান সেটিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে তার দ্বারা সবকিছু সম্ভব । তিনি মানুষের ভেতরের এসব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার কথা বলেছেন । প্রায় ১০০ বছর পুর্বে সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে টুকরো জমির আল উঠিয়ে একত্রে ফসল ফলানো, উৎপাদিত ফসল সমবায় গোলায় রাখা এবং পণ্য বিপণনের সুযোগ্য ব্যবস্থার ওপর গুরত্ব আরোপ করেছেন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । এর ফলে কৃষকের শ্রম সাশ্রয় হয়, পরিবহণ ও বিপণন খরচ কম হয় । কৃষকের পক্ষে তার শ্রম অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে আয় বাড়ানো সম্ভব । রবীন্দ্রনাথ খুব গভীরভাবে অবলোকন করেছিলেন কৃষক তার আলবাধা সুনির্দিষ্ট জমিতে হালের লাঙ্গল ও জোয়াল ব্যবহার করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সামান্য ফসল পায় যা দ্বারা তার জীবন নির্বাহ ও কৃষিঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে । কৃষকের এই নিস্পেষিত জীবন তাঁকে বিষণ্ন ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে । কিভাবে সমবায়ের মাধ্যমে জমি একত্রিকরণ করে যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানো যায় সে তথ্য কৃষকের দ্বারে গিয়ে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার চিঠিতে তিনি বলেন–

"চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায় । এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে–জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি–অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না । মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা । কিন্তু এ দুটো পন্থাই দুরূহ । প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না । কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম । শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে । ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি-একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায় । এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি সচক্ষে দেখেছি । চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে ।"[৫]

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চিত্র হলো কৃষকরা সবসময় দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত । এবং তাদের এ অবস্থা অপরিবর্তনীয় । দরিদ্র ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনীরা ততোধিক ধনী হচ্ছে । এর কারণ হলো বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের ভয়ঙ্কর আগ্রাসন । এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলা । তিনি মনে করতেন মানুষ তার কর্মদক্ষতা দিয়ে উৎপাদন ও উপার্জন করতে পারে এবং এর সুফল সম্মিলিতভাবে ভোগ করতে পারে । সমবায়ের পথ হলো সত্য ও ন্যায়ের পথ । একমাত্র সমবায়নীতির মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে তার আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস এবং সমবায়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে অংশীদারিত্ব, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও ভরসার অর্থনীতি ।

মানবিক উন্নয়ন ভাবনা

ইংরেজি 'Development' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'উন্নয়ন'। উন্নয়ন শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত উন্নয়ন বলতে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের কোন্ অবস্থানকে বুঝায় অথবা এর কোনো পরিমাপক বা মানদণ্ড আছে কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্য ঘোচেনি।'উন্নয়ন' শব্দের সজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্যের বিশ্লেষণ আজকের আলোচ্য বিষয় নয়, জমিদার কবি মানবিক উন্নয়ন নিয়ে কি ভাবতেন সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করার প্রয়াস এখানে। মানবিক উন্নয়নকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রথমে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের উন্নয়ন আর মনুষ্যত্বের উন্নয়নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো সামাজিক, মানবিক ও সামগ্রিক উন্নয়ন।

তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজ ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ধনিক শ্রেণি, অপরটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী । রবীন্দ্রনাথ একটি অংশকে পেছনে ফেলে অপরাংশের উন্নয়নের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মানবিক উন্নয়ন ধারণাটি ছিল মূলত গ্রামোন্নয়নকেন্দ্রিক।তাঁর গ্রামোন্নয়ন ভাবনাটি ছিল সামগ্রীক উন্নয়ন ভাবনার অংশ। তিনি মনে করতেন, কৃষিভিত্তিক গ্রামের উন্নতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষীয় সমাজের সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেহেতু আশি শতাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবি। একদিকে কৃষকসমাজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শহরের চাকচিক্যময় সমাজ অপরদিকে প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার নিম্নমান ও শিক্ষার আলোবঞ্চিত-চিকিৎসা সুবিধাবঞ্চিত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দারিদ্র্যের চাকায় আষ্টেপৃষ্টে নিষ্পেষিত অমানবিক জীবনযন্ত্রণা জমিদার কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই ভাবনার পেছনে কাজ করেছে তাঁর মানবিক চেতনা। তিনি চির অধিকারবঞ্চিতএই মানুষগুলিকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার অনুকুলে সেচ্চার ছিলেন। স্বদেশী সমাজ গড়ে তোলা, গ্রাম-গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তিনি স্কুল নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মান, সুপেয় জলের জন্য পুকুর খনন, স্যানিটারির সুব্যবস্থা, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এসবই ছিল তাঁর সমাজনৈতিক ভাবনার অন্তর্গত মানবিক উন্নয়ন ভাবনা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> ''আজ চূড়ান্ত বিচারে মানব উন্নয়ন মানে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। 'মানুষের উন্নয়ন' বলতে বুঝায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব সক্ষমতার বৃদ্ধি ও প্রসার। উন্নয়নের সুফল প্রত্যেক মানুষের জীবনে পৌঁছে দেয়ার অন্য নাম মানুষের জন্য উন্নয়ন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে শুরু করে সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন ভোগ করতে পারে। মানুষের দ্বারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে বোঝায়। এ অংশগ্রহণ শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব দিক মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, সে সব দিক নিয়ন্ত্রণ নয় বরং সে দিকগুলোকে প্রয়োজনবোধে প্রভাবিত করার সুযোগ প্রতিটি মানুষের থাকে। তাহলে সে মাত্রিকতাকেই মানুষের দ্বারা উন্নয়ন বলে অভিহিত করা হয়।''[৬]

তাঁর উন্নয়ন ভাবনাগুলো ছিল মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক। তিনি মনে করতেন আত্মিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। কেবলমাত্র বাহ্যিক অবকাঠামোগত উন্নয়নই উন্নয়ন নয়, একটি সমাজের সকল মানুষ যখন তাঁর মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে তখনই সে সমাজ উন্নত বলে ধরে নেয়া যাবে।এবং কোনো বিশেষ শ্রেণি নয় উন্নয়নের সুফল প্রতিটি মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়াকে তিনি সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রগবেষক অহমদ রফিক বলেন–

> ''মূলত মানবিক বোধে জারিত হওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে এমন কথা ভাবতে ও বলতে পেরেছিলেন যে 'শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষের সমান অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে'। বহুকাল পূর্বে মানবাধিকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ উচ্চারণ আজকের মানবাধিকার কর্মীর কথা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে আজকালকার মানবাধিকার আন্দোলন প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, শিক্ষিত শ্রেণীভিত্তিক, সামান্যই গ্রামভিত্তিক। রবীন্দ্রচেতনা মানবিকতার গুণে ঋদ্ধ ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বশ্রেণী থেকে বিত্তবান বা মধ্যশ্রেণীর চরিত্র উন্মোচন করতে দ্বিধা করেননি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক–সামাজিক প্রেক্ষাপটে। শ্রমজীবী মানুষজন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর শোষণ তার কাছে অমানবিক বলে মনে হয়েছে। গ্রামীণ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শুধু কৃষকের অর্থনৈতিক সমস্যাই অনুধাবন করেননি, লক্ষ করেছেন গ্রামে গ্রামে জমিদার-মহাজন শ্রেণীর বাইরেও মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব।''[৭]

মানবিক উন্নয়ন ও আত্মিক উন্নয়ন ওতপ্রোত। আত্মিক উন্নয়ন না ঘটলে মানুষ ক্রমশ হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। তখন তার নৈকিতার পথচ্যুতি ঘটে এবং হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে যে কোনো ধরণের অন্ধকার পথ বেছে নিতে দ্বীধাবোধ করে না। সমাজে সৃস্টি হয় নানারকমের হানাহানি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের অবনতি ঘটে । এককথায় সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়

এবং সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় ঘটে। বিশ্বজুড়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এ অবস্থার একটি করুণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয়।

ক্ষুদ্রঋণ ভাবনাঃ

পল্লী উন্নয়ন ভাবনার একটি অংশ হলো জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রঋণ ভাবনা। তিনি মনেপ্রাণে ধারণ করেছিলেন যে কৃষিপ্রধান এদেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতিত সামগ্রীক সমাজকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব নয়।পৈত্রিক জমিদারি ভাগাভাগির পর তাঁর ভাগে পড়ে পতিসরের কালিগ্রাম পরগনার জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব যেখানকার আশি ভাগ প্রজা ছিল মুসলিম এবং তারা ছিল কৃষিজীবী। এক ফসলী জমি ছিল অনুর্বর। উপর্যুপরি যে বছর বন্যা বা ক্ষরা হত সে বছর কৃষকের দঃখের অন্ত ছিল না। পাশাপাশি জমির খাজনা মেটাতে তাদেরকে উচ্চসুদে মহাজনের দারস্থ হতে হতো। কৃষকের জীবনে নেমে আসত চরম বিপর্যয়। প্রজাদরদি জমিদার কবি কৃষকের এই দুঃখ-দুর্দশা অবলোকন করে পতিসরে একটি কৃষিব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নলেন। প্রথাসিদ্ধ অন্যান্য জমিদারদের মতো তিনি কুঠিবাড়িতে বসে প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে খুব কাছাকাছি গিয়ে তাদের দুরবস্থার কথা জেনে নিতেন। প্রজাদের ও গ্রামের হতশ্রী অবস্থা সরেজমিনে অবলোকন করে অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল কবি মর্মাহত হন এবং তাদের ঋণজর্জরিত জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্তিদানের জন্য কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আহমদ রফিক লিখেছেন–

> ''আর ঋণ জর্জরিত কৃষককুলকে মহাজনের হাতে থেকে রক্ষা করার জন্য ধারদেনা করে স্থাপন করেছিলেন সমবায়ভিত্তিক 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' (১৯০৫)। এর সুফল দুস্থ গ্রামীণ কৃষকদের ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল যে জন্য শোষক মহাজনদের শেষ পর্যন্ত এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়।''[৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে কৃষি ব্যাংকটি স্থাপন করেছিলেন বটে কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে। বার্ষিক শতকরা মাত্র ১২ টাকা হারে ঋণ দেয়া হতো এই কৃষিব্যাংক থেকে। পতিসরে ব্যাংক স্থাপনের পূর্বে তিনি শিলাইদহে একটি সমবায়ভিত্তিক কৃষিব্যাংক স্থাপন করেছিলেন বলে অপর একটি তথ্যমতে জানা যায়।

শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক দারিদ্র্য বৈষম্য অতীতে যেমন ছিল বর্তমানের চিত্র আরো ভয়াবহ যা থেকে আমাদের সমাজকাঠামোর মুক্তি ঘটেনি আজো অবধি। কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এলিট শ্রেণি কর্তৃক কৃষকসমাজকে স্বল্প মজুরির দ্বারা শ্রম শোষণ। বর্তমান আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রঋণদানের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহযোগিতা করা। আহমদ রফিকের ভাষায়–

> ''বাংলাদেশের মোটামুটি হিসাবে প্রায় ১৩,০০০ বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিও গ্রামাঞ্চলে রয়েছে। . . . সন্দেহ নেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয়ের ব্যবস্থা করতে, উপার্জন ক্ষমতা বাড়াতে দুঃস্থদের জন্য এ ধরণের প্রকল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট–বিশেষ করে ভূমিহীন শ্রমজীবী মানুষ, সহায়হীন বিধবা গ্রামীণ মহিলা এবং অনুরূপ ক্ষেত্রের দুঃস্থ মানুষের জন্য। . . . কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক সফলতা নিশ্চিত করতে হলে একাধিক শর্তের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। যেমন নিয়মিত ঋণদান পদ্ধতি, ঋণের প্রয়োজন–নির্ভর পরিমাণ, সময় মতো ঋণদান এবং ঋণ পরিশোধের সহায়ক শর্তাবলী ও সুদের পরিশোধযোগ্য হার। তা না হলে ঋণদান অর্থহীন হয়ে ওঠে এই অর্থে যে এতে ঋণগ্রহীতার আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয় না। ফলে এর প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে বিপরীত। এমন কি ঋণ বিনিয়োগের পরিবর্তে জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক খরচ মেটাতে ব্যবহৃত হয়ে যায়। তখন ঋণ অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের বদলে গ্রহীতার জন্য গলার ফাঁস হয়ে ওঠে। ক্ষেত্র বিশেষে এর পরিণাম হতে পারে মর্মান্তিক।''[৯]

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তা এত বেশি কঠিন শর্তযুক্ত থাকে যে তাতে কৃষকের কল্যাণ বেশি নাকি ব্যাংকের কল্যাণ বেশি হয় তা ভেবে দেখার বিষয়।

সাম্য ভাবনাঃ

সময়ের দাবির সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি বাড়ছে একইসঙ্গে দারিদ্র্যেরও হার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।এবং বাড়ছে শ্রেণিবৈষম্য। ধনীরা ক্রমশ ধনী হচ্ছে আর দরিদ্ররা হচ্ছে দরিদ্রতর । পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা খুব নিকট থেকে দেখার কারণে তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল শ্রেনিবৈষম্যের প্রকৃত চিত্রটি । ধন-সম্পদ যখন একটি শ্রেণির হাতে পুঞ্জিভুত হতে শুরু করে তখন তাদের মাঝে একধরনের লিপ্সা তৈরি হয়। তিনি ধনীর সম্পদ কেড়ে দরিদ্রদের মাঝে বন্টনের যে সাম্যবাদ, তার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন উন্নয়ন ও সুবিধা সকলে যেন ভোগ করতে পারে অর্থাৎ ভাগাভাগির আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা। তিনি স্বর্থপরের মতো কোনোকিছু একা ভোগের বিপক্ষে ছিলেন। সামন্তবাদী এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর ভেতরে বাস করত এক মূর্তমান মনবিক মানুষ যা তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছিল শ্রেণিবৈষম্য একটি সমাজকাঠামোতে অসন্তোষের আগুনের উৎপত্তি ঘটায়। তিনি সুখ–দুঃখের ভাগাভাগির অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন, অন্যকে পেছনে ফেলে একা ভোগ করার বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য–

> "আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনো দিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?"[১০]

সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ একটু ভিন্নমত পোষণ করতেন। মার্কস সর্বশ্রেণির সকল পেশার সমন্বয়ে গঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজকাঠামোর কথা বলেছেন তিনি সামাজিক বৈষম্যকে ভেঙ্গে ফেলে তিনি নতুন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমাজের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানোর কথা। সাম্যবাদী সসমাজগঠনে রবীন্দ্রনাথ মার্কীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। আহমদ রফিক বলেন–

> ". . . কিন্তু মার্কসবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার পার্থক্য বিষয়টির চরিত্র অনুধাবন সত্ত্বেও এর ব্যবহারিক কার্যক্রমে ভিন্নতা। শ্রমের শক্তি ও শ্রমিককে শোষণ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ, সেখানে রাখঢাক কিছু ছিল না। শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের পথ না-ধরা সত্ত্বেও নীতিগত দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার মৌলিক পার্থক্য বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ধনী কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের দিকটাও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার সংগ্রামী পথ না ধরে গ্রামের জনশক্তিকে সংহত ও সংগঠিত করে তাদের অর্তনৈতিক উন্নয়নের সংস্কারমূলক চেষ্টা চালিয়েছেন। আর এ প্রচেষ্টায় তাঁর প্রধান নীতিগত অবলম্বন ছিল সমবায় ব্যবস্থা।"[১১]

তাঁর গ্রামোন্নয়ন ভাববনা ছিল একটি সাম্যবাদী অর্থনৈতিক মডেল। জনদরদী এই কবি অপরিসীম মমতা দিয়ে তিনি পল্লীর মানুষের দুঃখ–কষ্টের চাকায় নিস্পেষিত জীবন অবলোকন করে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

দারিদ্র্য ভাবনাঃ

দারিদ্র্য প্রতিটি সমাজের অবয়বে অংকিত এক দুষ্ট ক্ষত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্য থেকে মুক্তির নানা দাওয়াই দিয়েছেন কিন্তু কোনো সমাজই দারিদ্র্যমুক্ত হয় নি। এ পর্যন্ত কোনো সমাজ থেকে চিরস্থায়ীরূপে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক সমাজে ধনী এবং দরিদ্র দুটি শ্রেণির পাশাপাশি অবস্থান বিরাজমান। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে কারণ দরিদ্রের উপার্জনের পথ থাকে রুদ্ধ। তারা এই দারিদ্র্যকে নিয়তি মেনে নিয়ে দারিদ্র্যের দাসত্ব করে চলেছে । রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির দারিদ্র্যমুক্তির পথ খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর মননে, কর্মে, কথায়,উদ্যোগে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে পল্লীর দরিদ্র্য মানুষের হতাশা দুর্ভোগ ও তাদের দারিদ্র্যমুক্তির কথা। এসব হতদরিদ্র মানুষদেরকে তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন মানুষ নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা। সুতরাং তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে মানসিকতার পরিবর্তন এনে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হবে । তিনি মনে করতেন প্রত্যেক মানুষ এক অফুরন্ত শক্তির আধার যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আপন ভাগ্য বদদলাতে পারে। এই উপমহাদেশের দরিদ্র্য পল্লীর এসব মানুষের দারিদ্র্যমুক্তি জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁর ভাবনা

ছিল সুদূরপ্রসারী, প্রযুক্তিনির্ভর ও যুগান্তকারী । সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক কাঠামো নিয়ে তৎকালীন মানুষ যা ভাবতে পারেনি তিনি তখনই তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত যান্ত্রিক চাষপদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদন ও আয় বাড়িয়ে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির যে পথ তা তিনি কৃষককে বাতলে দেন। উন্নত কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি তিনি শ্রীনিকেতনে বাটিক, সিরামিক ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিকভাবে সহায়তা করেন। এছাড়া ধানভানা কল, আখচাষ, তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, আখমাড়াই কল, হাঁস-মুরগির খামার, বেত ও বাঁশশিল্প, মৃৎশিল্প, ছাতা তৈরি, ভুট্টাচাষ, আলুচাষের মাধ্যমে ইত্যাদি বিকল্প উপার্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এভাবে পল্লীর হতদরিদ্র্য মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। আহমদ রফিকের মতে–

> "দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য নতুন নতুন অর্থকরী দিক খুলে দেয়ার চেষ্টা ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনো কৃষিক্ষেত্রে গতানুগতিক চাষাবাদের বাইরে নতুন কোনো ফসল ফলানোর চিন্তা নিয়ে মেতে উঠেছেন। শুধু চিন্তাই নয় হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেসবের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করেছেন। যেমন রেশম চাষ তেমনি পতিসরের শুকনো মাটিতে গোলআলু চাষের কথাও ভেবেছেন। এদেশে তখনো আলু চাষের রেওয়াজ হয়নি।"[১২]

দারিদ্র্য মানুষের জীবনে বহুমূখী সমস্যার সৃস্টি করে এবং সহজ-সরল-স্বভাবিক জীবনের পথ রুদ্ধ করে দেয়। নিশ্চল করে তোলে উন্নয়নের স্বভাবিক গতিকে। দারিদ্র্য, হতাশা, অশিক্ষা, কুসংস্কার পরস্পর সমান্তরালে গতিময় হয়ে ওঠে। সুতরাং দারিদ্র্য পরিষ্টিত সংস্কৃতিবিহীন এরূপ সমাজকাঠমোর উন্নয়ন আশাতীত। তিনি মনে করতেন, মানুষের জন্য মানুষ এই কথাটি যতদিন মানুষ উপলব্ধি করতে না পারবে ততদিন সমাজের উন্নয়ন সুদূরপরাহত। দুর্নীতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব একটি সমাজকাঠামোকে বিকল সমাজে রূপান্তরিত করে এবং সেখানে দারিদ্র্য চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে। এপ্রসঙ্গে আতিউর রহমান বলেন–

> "দারিদ্র্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে মানুষের মনের দৈন্যকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে অন্যায় ও পার্থিব দারিদ্র্যের চেয়েও বহুগুণ নিকৃষ্ট হল জনগণের ভেতরের নিরাশা। আর সেকারণেই যথোচিত মানসিক প্রবণতা তৈরির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাই অনুভব করেছেন যে গরিবদের সমবেত হতে হবে, জোট বাঁধতে হবে। একা একা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা যাবেনা। বাইরে থেকে এসেও কেউ গরিবের দুঃখ বঞ্চনা দূর করতে পারবে না। ভেতর থেকেই তা দূর করতে হবে।"[১৩]

দারিদ্র্য আমাদের জীবনের এক দুষ্ট ক্ষত। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাবনা ভেবেছেন। শুধু ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি , বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ণ করেছেন। দারিদ্র্য দুরীকরণে রবীন্দ্রন্দ্রনাথের এসব ভাবনা কালোত্তীর্ণ যার গ্রহনযোগ্যতা আজো আমাদের সমাজে স্বীকৃত এবং অনুকরণীয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে তিনি সমবায়নীতির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একমাত্র দৃঢ়চেতা, সৎ, মানুষই পারে মানুষের ভেতরের আত্মবিশ্বাসী মানুষকে জাগিয়ে তুলতে, যিনি হবেন সমাজ প্রবর্তক ও পরিবর্তক এবং তাঁর দ্বারাই সমাজ ও রাষ্ট্র হবে চিরদারিদ্র্যমুক্ত যুগে যুগে সমাজে এমন প্রতিনিধি ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

শিক্ষা ভাবনাঃ

প্রাচীন ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে শুরু করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল একটি নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা, যারা দাসত্ব করবে ঔপনিবেশিক প্রভুদের। পরবর্তীকালে একই ধারাবাহিকতায় কেরানী বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা ছিল এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী প্রক্রিয়া। তাঁর মতে কেরাণী সৃষ্টি নয়, মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মচেতনার বিকাশ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। স্বশিক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন কিভাবে বাঙালী সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং শোষণ করা হচ্ছে। তাই তিনি বাংলভাষার আলোকে এই জাতিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নতুন করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার কথা ভাবেন। এবং সমাজের তরুণদের প্রতি নিজেদের শেকড় ও ঐতিহ্যের সন্ধানের জন্য আহবান জানান।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে তিনটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভাববাদী, প্রকৃতিবাদী এবং প্রয়োগবাদী। তাঁর শিক্ষাভাবনার একটি চিত্র পাওয়া যায় তাঁর 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে–

> "তুমি কেরানীর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ণষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যন্ত ইড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা–এই কথাটি আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।"[১৪]

তাঁর মতে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হলো প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে নিবিড় বন্ধনের একাত্মতা। তাই তিনি প্রকৃতি সমৃদ্ধ শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষালয়ের উপযুক্ত স্থান হিসেবে। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বিদেশী কোনো ভাবনা অনুকরণ করার প্রয়াস ছিল না। কেবলমাত্র বাঙালী সংস্কৃতিতে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর শিক্ষাভাবনায় সম্পূর্ণভাবে বাঙালী চেতনার প্রতিফলন ঘটলেও প্রাচ্য থেকে আগত বিজ্ঞান শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় ঘটান। একইসঙ্গে মানবচেতনা তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজিত করেছে ঐক্য, সংহতি ও সাম্যের সংমিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁর মতে, শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর মাঝে সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নকে তিনি আপত্তিকর বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হতে হবে যা মানুষের জীবনঘনিষ্ট। এ প্রসঙ্গে আতিউর রহমান বলেন–

> "শিক্ষাপ্রণলী কেমন হওয়া উচিত–এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে। কেননা জীবন আর শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নয়। মূলতঃ জীবনচলার জন্যে, সুন্দর ক'রে বাঁচার জন্যে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শিক্ষা তাই জীবনবিচ্ছিন্ন কোনো প্রস্তাবনা হতে পারে না।"[১৫]

শেষ কথাঃ

রবীন্দ্রনাথ একজন শুদ্ধ কবি হয়েও মানবসমাজের এমন কোনো দিক নেই যেদিকটাতে তাঁর ভাবনার স্পর্শ পায়নি। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন দার্শণিক ভাববাদী অপরদিকে ছিলেন জীবনবাদী। আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জীবনবাদের সমন্বিত রূপের মাঝে নিহিত রয়েছে তাঁর ভাবনাগুলোর প্রকাশ অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক পদক্ষেপ। মানবকল্যাণচেতনা সমৃদ্ধ এই কবির লেখায়-মননে-কর্মে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের কথা উঠে এসেছে পুনঃপুনঃ। তাঁর সাহিত্য ও কর্মসাধণায় মানুষের প্রতি যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ছিল। তিনি মনে করতেন, মোহমুক্তবুদ্ধি, সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি এবং অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তির মাধ্যমে মানুষের জাগরণ ঘটে। দীর্ঘজীবনব্যাপী তিনি প্রতিটি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায় আলোড়িত হয়েছেন এবং কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিল প্রত্যক্ষ। মানুষের প্রতি, জীবের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁর জীবনাদর্শের মূল বক্তব্য। বাঙালী সংস্কৃতির রূপকার রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরকালের অহংঙ্কার। উপমহাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের এক পরম নির্ভরতা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের সমাজে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা ইতিবাচক। কোনো কোনো মহলের বিতর্ক, বিরোধিতা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, তাঁর আর্থ-সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে চিরন্তন।

তথ্যসূত্র

১. মুখোপধ্যায়, প্রভাতকুমার (২০০৭)। রবিজীবনী। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ৫ম খণ্ড: পৃঃ ২৯১-২।

২. মুখোপধ্যায়, শিশির (২০১০)। *শ্রীনিকেতন: রবীন্দ্রনাথের পল্লিসংগঠন ও কৃষিচিন্তার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান*। তপনকুমার সোম সম্পাঃ *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন। পৃঃ ৪৬২।

৩. আহমদ রফিক (২০১১)। নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ। ১ম খণ্ড: পৃঃ ৪৬৭।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সমবায়নীতি*-১, *রবীন্দ্র রচনাবলী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৪শ খণ্ড: পৃঃ ৩১৩।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রাশিয়ার চিঠি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১০ম খণ্ড: পৃঃ ৫৬২-৩।

৬. বাদল কুমার ঘোষ (১৪০৬ বাং)। *বিকল্প উন্নয়ন দর্শন; রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার আলোকে*। *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*। ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক সংখ্যা: পৃঃ ১৬৮

৭. আহমদ রফিক (১৯৯৮)। *রবীন্দ্রভূবনে পতিসর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ। পৃঃ ১৮৫-৬।

৮. আহমদ রফিক (২০১১)। নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ। ১ম খণ্ড: পৃঃ ৪৬৯।

৯. আহমদ রফিক (২০১১)। নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ। ১ম খণ্ড: পৃঃ ২০৩।

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯৩ বাং)। রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ২য় খণ্ড: পৃঃ ৬২৪।

১১. আহমদ রফিক। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬৪।

১২. উপর্যুক্ত। পৃঃ ৭৫।

১৩. আতিউর রহমান (২০০৪)। *রবীন্দ্র চিন্তায় দারিদ্র্য ও প্রগতি*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন। পৃঃ ৬৯।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *লক্ষ্য ও শিক্ষা*; রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ত্রয়োদশ খণ্ড: পৃ:৭০০।

১৫. আতিউর রহমান (২০০৮)। রবীন্দ্রভাবনায় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। পৃ:১০৯।